মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি তার তাফসীরুল কোরআন

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাবেক বঙ্গের বিগত পাঁচশত বৎসরে যেসব মহান (great) ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছেন তাদের একজন, সম্ভবত ৪/৫ জনের মধ্যে হবেন। তিনি রাজনীতিতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন এবং সংবাদপত্র জগতের পুরোধা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন লেখক। ইতিহাস, সাহিত্য, নবী জীবন এবং কোরআনের গবেষক, লেখক এবং সাহিত্যিক।

নবী জীবনের উপর রচিত মুস্তাফা চরিত যারাই পড়েছেন তারাই জানেন যে তিনি কত বড় গবেষক ছিলেন। তিনি রাসূল (সা) জীবনী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাতে কল্পকাহিনী ত্যাগ করেছেন, কেবল প্রমাণ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন কুটিল এবং অপ্রামান্য সমালোচনায় যুক্তি সংগত উত্তর দিয়েছেন। তাতে তিনি এ সংক্রান্ত কিছু হাদিসও পরীক্ষা করেছেন এবং এসব হাদিসের মতন (text) পরীক্ষা করে, উসূলবিদদের মতন পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। তার সঙ্গে সবাই একমত হবেন এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তার গবেষণা আমাদেরকে পথ দেখাবে, বিচার বিবেচনাকে বৃদ্ধি করবে। তার *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* একটি অসামান্য কৃতি। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক এবং বিশ্লেষণমূলক বই খুব কমই আছে।

মাওলানা আকরম খাঁর অসামান্য কৃর্ত্তি হচ্ছে তার কোরাআনের অনুবাদ ও তফসীর, তফসীরুল কোরআন। এ তফসীর তিনি সাধু ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য, মিষ্ট, যেন নদীর মতো প্রবাহমান। অনেক অনুবাদের চেয়ে তার অনুবাদ ভালো। আমার কাছে তার অনুবাদ বাংলায় শ্রেষ্ঠ অনুবাদ মনে হয়েছে। অনুবাদে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শব্দ ব্যবহার তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১. 'তাকওয়া' শব্দের তিনি কয়েকটি অর্থ করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সংযম। যেমন সূরা বাকারায় অনুবাদে "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" এর অনুবাদ করেছেন, "যেমতে তোমরা সংযমশীল হইতে পারিবে"।

২. 'ফাসেক' শব্দের তিনি অনুবাদ করেছেন 'দুষ্কর্মপরায়ণ'। এটি আমার বিবেচনায় খুবই সুন্দর অনুবাদ হয়েছে। (দ্রষ্টব্য সূরা বাকারার ২২নং আয়াতের অনুবাদ, তফসীরুল কোরআন, ঝিনুক প্রকাশনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮)।

৩. তিনি সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতের 'আসমায়া' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বস্তু তত্ত্বগুলি' যা এর অসাধারণ অনুবাদ (ঐ, পৃষ্ঠা ৫৪)।

তিনি যথাসম্ভব তার অনুবাদে নারী সম্পর্কিত বিষয়সমূহে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং যেখানে নারীর অগ্রগণ্যতা আছে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা আল ইমরানের ৩৬নং আয়াতের 'লাইছাল জাকারু কাল উন্‌সা' বাক্যাংশের অনুবাদ করেছেন 'অথচ পুরুষ তো নারীর সমতুল্য নহে' (ঐ, পৃষ্ঠা -৩৯৫)। যারা সব সময় সূরা নিসাব ৩৪ নং আয়াতের কথা বলেন, তাদের এ আয়াতের কথাও মনে রাখা উচিৎ। তাহার তাফসীরে বিভিন্ন ঘটনার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি নবীদের মোজেজায় বিশ্বাস করতেন, কিন্তু অপ্রামান্য যুক্তিহীন কথা বিশ্বাস করতেন না।

তিনি মুসার (আ) বনী ইসরাইল সহ মিসর থেকে পলায়নের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মূল কথা হলো তারা লোহিত সাগর দিয়ে পার হননি, নীল নদ দিয়ে পার হয়েছেন। পূর্বের তফসীরগুলিতে প্রধান বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এবং কিংবদন্তীগুলিকে ভিত্তি করা হয়েছে, কোরআনের কোনো অকাট্য আয়াত নয় বা প্রামান্য হাদিসও নয়। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

"আলোচ্য আয়াতের (সূরা বাকারার ৫০ আয়াত) প্রথম অংশে 'ফারাক্‌না' ও 'আলরাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহর শব্দের অর্থ সম্পর্কে অভিধানকাররা বলেছেন,

১. অধিক পরিমাণে সঞ্চিত পানি, কেবল লোনা পানি (কামুছ)।
২. প্রত্যেক নহরই বাহর (জাওহারী)।
৩. বাহর স্থলের বিপরীত শব্দ - লোনা পানি, প্রত্যেক বড় নহর, যে কোনো প্রশস্ত বস্তু (মাওয়ারেদ)।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নীল নদীর তীরবর্তি কোনো এক অঞ্চলে ইসরাইলীদের বসবাস ছিল। (সেখান থেকে) তারা যাইতেছিল পূর্ব পুরুষের দেশে। ... ফিলিস্তিন ও যিরুশালেমই ছিল তাদের গম্যস্থান। মিশরীয় সীমা অতিক্রম করার পরই তারা উপস্থিত হইয়াছিল ছীনা উপদ্বীপে এবং তীহ প্রান্তরে। কোরআন মজীদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ মওজুদ আছে (তাহা ৮০ আয়াত প্রভৃতি)।"

তারপর আকরাম খাঁ সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে যে, মিশর থেকে ৫০০ মাইল গভীর সমুদ্র পথ পার হয়ে আরবে উপনীত হয়ে, সেখান থেকে ফিলিস্তিন যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা তাদের লোক সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের যানবাহনও ছিল না এবং পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। তার পরিবর্তে মিসর থেকে একটি হ্রদ বা তাহার বেলাভূমি পার হয়ে সিনাই পৌঁছা অনেক সহজ ছিল। তিনি বলছেন, ফেরাউন যে স্থানে ডুবে মরে ছিলেন তার জন্য বাহর এবং ইয়াম দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটির অর্থই নদী বা যে কোনো

জলাশয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ফেরাউন যে লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছিল, ইহা ইহুদী বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের বর্ণনা মাত্র। কোরআন বা হাদীসে এই দাবির কোনো সমর্থন নাই।

এরপর তিনি উপসংহার করেছেন এভাবে, "সুয়েজখাল কাটার পূর্বে ভূমধ্য সাগর হইতে সুয়েজ শহর পর্যন্ত দীর্ঘ এই ভুভাগটা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন হ্রদ, বিল, হাউড় নানা শ্রেণীর জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল এবং বহুস্থানে এখনও আছে। মরা কোটালের সময় এই অঞ্চলের পানি স্বাভাবিক নিয়মে অনক কম হইয়া যাইত। এই সময়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু চরগুলি ভাসিয়ে উঠিত। তাহার পার্শ্ববতী অগভীর জলাভূমিগুলি শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার ভরা কোটালের সময় জোয়ারের পানি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থানগুলিকে ডুবাইয়া ফেলিত। ... হযরত মুসা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই ঠিক সময় অর্থ্যাৎ উপযুক্ত তিথিতে মিশর হইতে যাত্রা করিয়া ছিলেন, এবং তিনি পথের নির্দেশও লাভ করিয়াছিলেন আল্লাহর হুজুর হইতে। তাই বনী ইছরাইল রক্ষা পাইয়াছিল এবং সেইজন্যই ফেরাউন ডুবিয়া মরিয়াছিল। আমার মতে হযরত মুসার নবী জীবনের প্রধানতম মো'জেজা ইহাই। (তাফসীরুল কোরআন, ঝিনুক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৯-৮৭)।"

তিনি তার তাফসীর "কোরআনে কোনো 'মানসুখ'' আয়াত নাই - এমত সমর্থন করেছেন। তিনি সূরা বাকারার ১৮৪ ও ১৮৫ আয়াতের তাফসীর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই আয়াতে (১৮৪ নং আয়াত) 'ইউতিকুনাহু' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি - "যাহারা রোজা সমর্থ হয় বিশেষ ক্লেশের সহিত" বলিয়া। আমার মতে ইহাই সঙ্গত অনুবাদ। ঈমাম রাজীও এই মতের সমর্থন করিতেছেন (তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড)। ইমাম রাগেবও তাহার অভিধানে আলোচ্য শব্দের এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তফসীরের রাবীগণের অধিকাংশ ইহার অর্থ করিয়াছেন - "যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রোজা না রাখে, তাহারা রোজার বদলে ফিদিয়া (মিসকিনের খানা প্রদান করিবে।" এ অসঙ্গত অনুবাদের ফলে, এ জামানার একদল প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যবস্থা দিতেছেন যে, কোনও ওযর আপত্তি না থাকিলেও ফিদিয়া দিয়া রোজা ভাঙ্গা যাইতে পারে। অন্যদিকে (একদল রাবী ও তফসীরকার) বলিতেছেন ১৮৪ আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫ আয়াত দ্বারা মানছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লাহর কালাম। একটা আয়াত নাজিল করার পর মুহূর্তে তাহাকে মানছুখ করিয়া দেয়ার খামখেয়ালী তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে না। বস্তুত: কুরআন মজীদে মানছুখ আয়াত একটিও নাই (তাফসীরুল কোরআন, পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫) ।

সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত যুক্তিসংগত টিকা দিয়েছেন। তিনি লিখছেন,
"এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইতেছে যে, স্ত্রীর যেরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্বামীর উপরা, স্বামীরও সেরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্ত্রীর উপর। উভয় নিজ নিজ কর্তব্য অবহিত হইয়া চলিলে, সংসারেই স্বর্গের সুখ শান্তি নামিয়া

আসে। নারীর তুলনায় পুরুষের দর্জা এক ডিগ্রী বেশী, অর্থাৎ পুরুষের কর্তব্য নারীর তুলনায় অধিক। সূরা নেসার ৩৪ আয়াতে পুরুষকে নারীর 'কাউয়াম' বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বলা হইয়াছে। মেসেল শব্দের অর্থ similar, equal নহে" (তাফসীরল, কুরআন সুরা বাকারার টিকা ১৮১, পৃষ্ঠা ২৭৫)।

তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পূর্বকালের দাসীদেরকে বিবাহ ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। তিনি লিখছেন, "এক শ্রেণীর আলেম মনে করেন যে, দাসী-বাদীদের বিবাহ করার নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা মনে করেন যে, দাসী-বাদীদিগকে, মালেকানা স্বত্বাধিকারের বলে, যথেচ্ছভাবে সদ্ভাব করা যাইতে পারে, সে জন্য বিবাহের দরকার হয় না। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিমত ইসরামের সাধরণ আদর্শ ও কোরআন প্রবর্তিত বিশেষ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে" (তাফসীরুল কোরআন, সূরা নিসা, টিকা নং ৭ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৫৮০)। এর পর তিনি ঐ মতের সম্পর্কে সকল যুক্তি পৃষ্ঠা ৫৮১-৮২ তে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এই তাফসীর এক সমাধারণ আধুনিক তাফসীর। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আসাদের তাফসীরের অনেকাংশে মিল রয়েছে। তাকে তাফসীরের ক্ষেত্রে এ উপমহাদেশের আসাদ গণ্য করা যায়।

তার যুক্তিবাদী তাফসীর অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে তিনি তার তাফসীরে যুক্তি ছাড়া কোনো মত দেননি।

এ তাফসীরের পুনঃমুদ্রণ ও ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন।